স্মৃতিমাল্য

বিরাট সংসারের দায়িত্ব মাথায় নিয়েও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বদাই থাকতেন আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা এবং অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ সাধনের জন্য তাঁর মন খুঁজে ফিরতো নির্জন শান্ত পরিবেশ। একদিন পেয়ে যান উপযুক্ত স্থানের সন্ধান। ভ্রমণকালে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন দিগন্তবিস্তৃত ভুবনডাঙ্গার মাঠের ছাতিমতলায়। এই শান্ত পরিবেশটি ভালো লেগে যায় দেবেন্দ্রনাথের। সেখানে আশ্রম তৈরী কোরে নাম দেন শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনে মহর্ষি পেয়েছিলেন তাঁর প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি। পরবর্তীকালে সমস্ত জায়গাটিরই নাম হয় শান্তিনিকেতন।

এই শান্তিনিকেতনেই পিতার অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, ভারতের পুরাতন আশ্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে। সততা, নিষ্ঠা, মানসিক দৃঢ়তা এবং কয়েকজন স্বার্থলেশহীন দরদী মানুষের শুভেচ্ছা ও সহায়তায় যে প্রতিষ্ঠানের বীজ তিনি বপন করেন তা ক্রমে মহীরুহের আকার ধারণ করে এবং "বিশ্বভারতী" নামে সুপরিচিত হয়ে ওঠে পৃথিবীতে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী সম্পর্কে বলেছেন :

"আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে। তারা যদি অন্তরের মধ্যে কোনো বাধা না পায় তবে তাদের এই আসার দ্বারাতেই আপনি এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরী হয়ে উঠবে। তীর্থযাত্রীরা যে ভক্তি নিয়ে আসে, যে সত্য দৃষ্টি নিয়ে আসে, তার দ্বারাই তাঁরা তীর্থস্থানকে সত্য করে তোলে। আমরা যারা এই আশ্রমে এসেছি, আমরা এখানে যে সত্যকে উপলব্ধি করব বলে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যাশা করি, সেই শ্রদ্ধার দ্বারা, সেই প্রত্যাশার দ্বারাই সেই সত্য এখানে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে। আমরা এখানে কোন মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব ? সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্, একটি নীড়, যেখানে বিশ্ব অবস্থান করবে। --- আজকের দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে মানুষ শুধু কোন বিশেষ জাতির অন্তর্গত না, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে সে মানুষ।"

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বমানবতার বাণী। ধীরে ধীরে বিশ্বভারতী পরিণত হয় বিশ্বমানবের এক তীর্থক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়েছেন জাপানিরাও। তাঁর জীবিত অবস্থাতেই শান্তিনিকেতনে জাপানিদের যাতায়াত শুরু হয় মূলত শিক্ষাগ্রহণ বা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। কবিগুরু নিজেও একাধিকবার জাপান ঘুরে গিয়েছেন। জাপানের সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং জাপানিদের অধ্যাবসায়, সৌজন্যবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ, সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ ও পরিশ্রম করার অসাধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে এর প্রশংসা করেছেন।

পরবর্তীকালে জাপান থেকে যাঁরা শান্তিনিকেতনে যান তাঁদের মধ্যে ৺সাইজি মাকিনো এবং শ্রী কাজুও আজুমার কথা বিশেষভাবেই মনে পড়ছে। শ্রী মাকিনো আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। শান্তিনিকেতনে "নিপ্পন ভবন" প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রী আজুমাও শারীরিক অসুস্থতায় বেশ কিছু বছর যাবৎ শয্যাশায়ী। এঁদের কারোর মুখ থেকে নতুন কোরে জানার সুযোগ নেই আশ্রমিক জীবনের অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা। এটা দুর্ভাগ্য বৈ আর কি হতে পারে। তবে বিগত তিন চার দশকে আরও বহু জাপানি শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের স্মৃতিচারণামূলক রচনা হাতে পাওয়ার সৌভাগ্য "অঞ্জলি"র হয়েছে। এরই একটি সংকলন দিয়ে সাজানো হয়েছে পরের কয়েকটি পাতা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে অঞ্জলির শ্রদ্ধার্ঘ্য এই স্মৃতিমাল্যখানি ।।

- রুমা গুপ্ত।